দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল ও প্রসঙ্গ ভাবনা

এ, এন, রাশেদা

এবারের এস এস সি পরীক্ষার বেশ আগে থেকেই শিক্ষকদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সে আন্দোলন ছিল শিক্ষা জাতীয়করণের লক্ষ্যে ৪ ও ১৫ দফার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের আন্দোলন। এই সুপারিশসমূহ তৈরি হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত কমিটির ১৯ মাস ধরে দীর্ঘ আলোচনা ও একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে। ১৫ দফায় যেসব দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তার মোদ্দকথা ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যেই শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি, পেশায় পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি আরও কিছু। যার ফলস্বরূপ মেধাবীরা অধিক হারে এই পেশায় আকৃষ্ট হবে এবং শিক্ষাব্যবস্থা উন্নততর হবে। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নততর অবস্থা দেশের অগ্রগতিকেই ত্বরান্বিত করবে। এ কথাগুলো সবারই জানা। অথচ এ ক্ষেত্রে দেখা গেল চরম অবহেলা। সরকার চুক্তি করেছিল, দাবি মানার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল; কিন্তু তা বাস্তবায়নের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ২৮ ডিসেম্বর '৯৩ স্মারকলিপি পেশ, পরবর্তীকালে সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদির মধ্য দিয়েও গণতান্ত্রিকভাবে শিক্ষক সমাজ তাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু সরকার ছিল অনড়। এভাবেই ঘনিয়ে এল এস এস সি পরীক্ষা। শিক্ষামন্ত্রী অনেকটা হুংকার দিয়েই অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে দিলেন, "যথাসময়ে এবং যেকোন মূল্যে পরীক্ষা হবেই।"

এভাবেই পরীক্ষা গ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সরকার প্রায় ছেলেখেলায় পরিণত করেছিল। অনেক জায়গায় শুধু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দ্বারাও পরিচালিত পরীক্ষার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের জন্যে নতুন নিয়মে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অনভ্যস্ত পরীক্ষার্থীরা অনেক ভুল করে বসল। কম্পিউটার কেন্দ্রকে এসব ভুল টপশিট বোর্ডে ফেরত পাঠাতে হয়েছিল। দেশবাসী এখন দেখছে সেই ভুলের মাত্রা কত ব্যাপ্ত এবং বিস্তৃত। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আন্দোলনের অংশ হিসেবে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষকের খাতা না দেখা এবং অনেক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের হাতে ১২০০ থেকে ১৫০০ উত্তরপত্র বিলিয়ে দেয়া। এরপরেও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর যথার্থভাবে যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশের আশ্বাস সচেতন মানুষদের বিস্মিত করেছিল। এখন প্রায় সাত লাখ পরীক্ষার্থী দিব্যচোখে দেখছে যথাসময়ে প্রকাশিত ফলাফল। পরীক্ষা না দিয়েই উক্ত বিষয়ে লেটার পাওয়ার ঘটনা–যা গিনেসবুক অফ রেকর্ডস–এ ঠাঁই পাওয়ার মতই। চার বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েও স্টার। ৬০ বা ৭৮ নম্বরের উত্তর দান করে ৮৭ বা ৯৪, সাধারণ মানের স্কুলের সকলেই ১ম শ্রেণী অধিকাংশের স্টার— যাতে শিক্ষকমন্ডলীই হন বিস্মিত। কেউ বলতে পারেন 'এসবই তো সুখের বিষয়'। তাই দুঃখের বিষয়ও কিছু উল্লেখের দাবিদার। পরীক্ষার ফলাফল শুনে এবং নম্বরপত্র দেখে বহু পরিবারে নেমেছে বেদনার ছায়া এবং ফলাফল মেনে নিতে না পারার মানসিক যন্ত্রণা। ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের জনৈক ছাত্রের ফলসহ বহু ভৌতিক ফল তো পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। দশ বছর ধরে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ভাল শিক্ষার্থী হিসেবে সার্টিফিকেট পেলেও ভূগোলে জুটেছে শুধুই শূন্য। কারো কারো ভাগ্যে চার বা পাঁচ। শোনা গেছে। ইংরেজির শিক্ষক না হয়েও ইংরেজির উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব পেয়েছিলেন কেউ কেউ, তেমনি ধর্মের শিক্ষক অংকের। তাই মেধা তালিকা থেকে ১১ নম্বর কম অর্থাৎ সর্বমোট ৮৭৩ পেয়েও ইংরেজি ১ম পত্রের রচনামূলক অংশে জুটেছে ০৫। সর্বমোট ৮৭০ নম্বর পেয়েও বাংলা ১ম পত্র রচনামূলকপত্রে পেয়েছে ০৭। উদাহরণ এমন অনেক দেয়া যাবে এবং যা দিতে মহামূল্যবান নিউজপ্রিন্টের শুধু অপচয় হবে, কিন্তু প্রাপ্ত নম্বরের হেরফের হবে না। কারণ শিক্ষামন্ত্রীর চোখ যে বাঁধা আর বোর্ড কর্তৃপক্ষের হাত–পা। তারা খেলছেন কানামাছি ভোঁ ভোঁ–এর খেলা। এরা 'যাকে পায় তাকে ছোঁয়'। তাই পরীক্ষা চলাকালীন দুর্ঘনাজনিত কারণে পরীক্ষা না দিলে কিংবা কারো দুঃখজনক মৃত্যু হলেও সে পায় স্টার। একইভাবে মেধাবীরা শূন্য, পাঁচ বা ছয়। কেননা এ যে শুধুই কানামাছির খেলা।

এখন প্রশ্ন হলো– কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে এসবের কৈফিয়ত কে দেবে? তাদের যে মানসিক পীড়ন তা কিভাবে প্রশমিত হবে? এতদিন ধরে যেসব বাবা–মা ভাল ফলাফলের আশায় তাদের সন্তানদের গড়ে তুলেছেন, এই অনাকাঙ্ক্ষিত ফল গ্রহণে তাদের সন্তানদের সান্ত্বনা দেয়ার বা নিজেদের সান্ত্বনা নেয়ার ভাষা কি হবে? এবারও কি বোর্ড কর্তৃপক্ষ Re-examine-এর প্রশ্নে সাফাই গাইবেন? বোর্ড কর্তৃপক্ষের এবার উচিত হবে পুরোনো ভাঙা রেকর্ড আর না বাজানো। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের যুগে এবং ঐ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতির–কালে তা হবে বড়ই বেমানান।

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছেও বলার আছে– পরীক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না, একগুঁয়েমিও চলতে পারে না। শিক্ষা নিয়ে অনেক ভাববার আছে— এর পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে, বিষয়বস্তু নিয়ে, এর বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে, পঠন–পাঠনের ধরন নিয়ে ইত্যাদি শত শত বিষয় নিয়ে। শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নততর অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য বিশাল শিক্ষক সমাজের দাবি–দাওয়া নিয়েও ভাববার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কারণ এ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হলে প্রয়োজন এই পেশার মান উন্নয়ন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস চালান। এই সত্য যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করা যাবে ততই মঙ্গল।

একটু পেছন ফেরা যাক। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এন্ট্রান্স পরীক্ষা পরিচালনা করত। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে ১৯৫০ সালে কলকাতা বোর্ড গঠিত হয়েছিল। তারই অনুকরণে ও দেশ বিভাগের কারণে ঢাকা বোর্ড গঠিত হল। ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ক্রমান্বয়ে ৪টি বোর্ড গঠন করতে হয়েছে। সময় এসেছে এখন বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাববার, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান নিজস্ব শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দিতে পারে কি না তা নিয়েও চিন্তা–ভাবনা করবার। পৃথিবীর উন্নত অনেক দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। একজন শিক্ষকের ওপর শতাধিক শিক্ষার্থী চাপিয়ে দিয়ে যেমন শিক্ষাদান চলে না, তেমনি শত শত খাতা একজনের ওপর মূল্যায়নের দায়িত্ব দিলে প্রকৃত মূল্যায়ন আশা করা যায় না। লাখ লাখ শিক্ষার্থীর খাতা ঐ পদ্ধতিতে মূল্যায়নের পর যতই ঝাড়াই–বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে ফল প্রকাশের চেষ্টা করা হোক না কেন, শতকরা একটি চোখের ভুল হলেও এক লাখে তা দাঁড়াবে এক হাজারটি ভুলে। যে ভুলগুলো ৪১,৫১ বা ৬১ পেলেও হবে ০১। কিংবা ৬০, ৭০ বা ৮০ পেলেও হবে হয়তবা ০০। আর এটা হবে দ্বিতীয়বারের ভুল। এভাবেই প্রতিবছর অভিশপ্ত হতে থাকবে শিক্ষার্থীর জীবন।

কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করলেই শিক্ষাব্যবস্থা যেমন আধুনিক হয় না, তেমনি ঐ একইভাবে খাতা দেখলেও নয়। আধুনিক হয় পাঠক্রমের বিন্যাসের সাথে সঙ্গতি রেখে পঠন–পাঠন পদ্ধতি ও প্রতিনিয়ত মূল্যায়নের ব্যবস্থাদি চালু করলে। অথচ এখানে তোতা পাখির মত নির্ধারিত প্রশ্ন সম্বলিত অন্যের তৈরি করা উত্তর মুখস্থ করে মেধা তালিকায় থাকার প্রতিযোগিতা চলে। এ ব্যাপারে অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না।" "অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না– বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।" "আমরা যতই বি. এ, এম. এ পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ ও পরিপক্ব হইতেছে না"। "হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিবার জন্য অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে: গ্রহণশক্তি, ধারণশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে হয়।"– অথচ আজও আমরা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে পারিনি। তাই আমরা শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক করার নামে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা কম্পিউটারাইজড করি।

শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করতে চাইলে শিক্ষক–শিক্ষার্থীর অনুপাত মেনে চলতে হবে। এই অনুপাত উন্নয়নশীল দেশের জন্য ১ : ৪০। যদিও উন্নত দেশের জন্য তা ১:২০। অধিক হারে মেধাবীদের এই পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে। শিক্ষকদের ট্রেনিং এবং মাঝে মধ্যে সেমিনার–সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। নানাভাবে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে শ্রেণীকক্ষের পাঠদান নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যাবে। সারাবছর ধরেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে; তাই দশম শ্রেণীর পাশের সার্টিফিকেট বোর্ডের দেয়ার আর প্রয়োজন পড়বে না। আর বোর্ড যদি সুষ্ঠুভাবে তা দিতে না পারে তবে তার যৌক্তিকতাই বা কোথায়? কাজেই প্রতিষ্ঠানের ওপরই এই দায়িত্ব অর্পণের চিন্তা–ভাবনা করা যেতে পারে, যেহেতু একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েই ভর্তি হতে হয়। তবে প্রতিষ্ঠানসমূহ ভর্তি পরীক্ষায় আগাম ভর্তি ফি গ্রহণ চালু করতে পারে এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানভেদে ৩০%, ৪০ বা ৫০% নম্বর না পেলে আগাম ফি বাজেয়াপ্ত হবে– এভাবেও প্রতিষ্ঠানগুলো মেধা যাচাইয়ের পথ খুঁজতে পারে এবং একই প্রতিষ্ঠানে ভিড় এড়াতে পারে। কিংবা এ ব্যাপারে ভিন্ন চিন্তাও কাজ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর সার্টিফিকেট প্রদানের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই তাদের নিজেদের শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলবার চেষ্টা করবে। শুধু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেবে না। দ্বাদশ ক্লাসেও একইভাবে বোর্ড ব্যতিরেকে সার্টিফিকেট দেয়ার চিন্তা করা যেতে পারে। উচ্চতর পর্যায়ে এসে ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতামূলক মেধা পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা এভাবে অবশ্যই কমে আসবে। যেমন প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদ, প্রাণী, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, অংক ইত্যাদি সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে একবারেই পরীক্ষা হতে পারে এবং তা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যেও। অর্থাৎ বর্তমানে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম অনুসরণে তা হতে পারে। এতে গরিব দেশে উচ্চতর পর্যায়ে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের ব্যয় কমবে। একইভাবে ব্যয় কমবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্টিফিকেট দিলে। এসব বিষয় বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। পরের প্রবন্ধে চেষ্টা করা যাবে। শিক্ষাব্যবস্থা উন্নততর করার ইচ্ছা থাকলে অনেক বিষয় নিয়েই ভাবতে হবে। শুধুমাত্র কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের ব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার কোন সুফল বয়ে আনবে না। শিক্ষার্থীদের মাঝে আনবে শিক্ষকদের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা, যা জাতির জন্য হবে ক্ষতিকারক ও ভয়াবহ।